ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য: প্রথম বাঙালি প্রকাশক

উদয় শংকর বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ: বাংলা প্রকাশনার বয়স দুশো বছরের বেশি কিছু। প্রকাশনা শিল্পকে বাংলায় যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের মধ্যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে পুস্তক বিক্রেতা, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদক। *অন্নদামঙ্গল* প্রকাশের মাধ্যমে ১৮১৬ সালে বাংলা প্রকাশনাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য মাত্রায়। তিনিই প্রথম বাঙালি প্রকাশক যিনি গ্রন্থে খোদাই চিত্র ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া *বাঙ্গাল গেজেটি (Bengal Gazette)* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের কৃতিত্বও তিনিই দেখিয়েছেন। তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে সচিত্র গ্রন্থ, চিকিৎসা, ব্যাকরণ বইসহ বিচিত্র বিষয়ের নানা প্রকাশনা। আলোচ্য প্রবন্ধে ইতিহাস বিস্মৃত প্রথম বাঙালি প্রকাশকের কর্ম ও জীবন ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

বাংলা প্রকাশনার বয়স দু'শ বছর অতিক্রম করেছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় যার সূচনা হয়। বাংলা প্রকাশনা তার পথ চলা শুরু করে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামক এক বাঙালি পুস্তক-প্রকাশকের হাতে। প্রকাশনার পাশাপাশি মুদ্রণ ব্যবসা, গ্রন্থপ্রণয়ন, সাংবাদিকতা এমনতর বহুবিধ কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। ইতিহাসবিস্মৃত চরিত্র গঙ্গাকিশোরের জন্ম সাল ও তারিখ সুনির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। এমনকি তাঁর পারিবারিক এবং ব্যক্তি জীবন সম্পর্কিত তথ্যাদি অনেকটাই অজানা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার বহরা গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন এমনটাই মনে করা হয়।[১] তিনি কর্মজীবন শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় কম্পোজিটর হিসেবে শুরু করেছিলেন। বাংলা প্রকাশনার আদিপর্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বা ছাপাখানাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শ্রীরামপুর বা ফ্রেডারিক্সনগর নামে খ্যাত দিনেমার এই শহরটির অবস্থান ছিল কলকাতা থেকে প্রায় পনেরো মাইল উজানে হুগলী নদীর দক্ষিণ তীরে। শহরটির আদি-ইতিহাস ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। ১৭৫৫ সালে এখানে দিনেমার উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং পরে ব্যবসাসহ নানাবিধ কারণে পর্তুগিজ অধ্যুষিত ক্ষুদ্র শহরটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাধীনভাবে বসবাস এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৯ সালে ইংরেজ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের ছোট একটি দল শহরটিতে আসে। কারণ, তখন পর্যন্ত শহরটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থার বাহিরে ছিল। এরকম অস্তানাই মিশনারিরা খুঁজছিলেন। মিশনারিদের কার্যকলাপে কোম্পানি শুরু থেকে অসন্তুষ্ট ছিল। বিশেষত মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে বাংলায় বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে এমন শঙ্কা কোম্পানির মনে হয়েছিল। আর তা যদি সত্যি-সত্যি হয় তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব পড়বে, ইংরেজরা সেটি কখনোই চায়নি। তাই, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম থেকে মিশনারিদের সাথে দূরত্বপূর্ণ ও অসহযোগিতামূলক এক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। সেজন্য উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৭৮৪), জশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) ও তাঁর স্ত্রী হানা মার্শম্যান, ডার্বির প্রাক্তন মুদ্রাকর উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩), ব্রানসডন, জন ফাউন্টেন এবং গ্রান্ট পরিবারের সদস্যরা নতুন জীবনের আশায়

* সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

কলকাতায় বসবাস না করে সোজা শ্রীরামপুরে চলে আসেন। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন বাংলা গদ্যের জনক উইলিয়াম কেরি।[২] এঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টিয় ধর্মপুস্তক প্রকাশ করা। খিদিরপুর থেকে আসার সময় কেরি মনিব জর্জ উড্‌নির কাছ থেকে উপহার পাওয়া কাঠের ছোট্ট মুদ্রণযন্ত্রটি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সাথে বাইবেলের অনূদিত পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল বাইবেলের বঙ্গানুবাদ দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা। যিশু খ্রিস্টের বাণী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের কেরির দীর্ঘদিনের ইচ্ছে পূরণ সম্ভব হয় শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানার কল্যাণে। ১৮০০ সালের ১৮ মার্চ এখান থেকে বাইবেলের অনুবাদ গ্রন্থ *মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত* প্রকাশিত হয়। বাইবেলের অনুবাদ ছাপার মধ্য দিয়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কার্যক্রম শুরু হয়। রামরাম বসু ও টমাস অনূদিত ডিমাই সাইজের ১২৫ পাতার এই ম্যাথুজ গজপেলের প্রকাশের মাধ্যমে ছাপাখানাটির যাত্রা শুরু করে।[৩] এখান থেকে ধর্মপুস্তকসহ বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ছাপাখানাটির প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ শুরু থেকে মানসম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করতে চেয়েছিল। এজন্য মিশন কর্তৃপক্ষ উইলিয়াম ওয়ার্ডের অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছিল। ছাপাখানার সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় ওয়ার্ডের উপর। তবে তদারকির মূল ছিলেন কেরি স্বয়ং নিজে। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এটিকে প্রথম শ্রেণীর ছাপাখানায় উন্নীত করেন। ছাপাখানার প্রধান দায়িত্ব ইংরেজদের হাতে থাকে আর বাঙালিদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ বরাদ্ধ রাখা হয়। ঐতিহাসিক শ্রীরামপুর ছাপাখানাটির সাথে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এবং পঞ্চানন কর্মকার নামক দু'জন বাঙালির নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। গঙ্গাকিশোর প্রথমে এখানে যোগ দেন, পরে বাংলা হরফের আদিশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন। হুগলীর ত্রিবেণী নিবাসী পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক।[৪] তিনি ব্রিটিশ সিভিলিয়ন স্যার চার্লস উইলকিন্স (১৭৫০-১৮৩৬)-এর সহায়তায় চলনশীল ধাতব হরফ নির্মাণ করেছিলেন। পঞ্চাননের তৈরিকৃত হরফে ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ (১৭৫১-১৮৩০) তাঁর *A Grammar of the Bengal Language* নামক বইটি প্রকাশ করেন। হরফশিল্পী পঞ্চানন কর্মকারের নাম শ্রীরামপুর মিশনারিদের নথিপত্রে যদিও আছে কিন্তু গঙ্গাকিশোরের নাম সেভাবে নেই।[৫] বিষয়টি চমকপ্রদ এবং একই সাথে অনভিপ্রেত।

গঙ্গাকিশোর মিশন প্রেসে থাকার সময় সাহেবদের কাছ থেকে ছাপাখানার নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক কিছু শিখেন। পরিশ্রমী ছিলেন বলে সাহেবেরা তাঁকে বেশ পছন্দ করতো। তবে অজ্ঞাত কোনো এক কারণে সাহেবদের সাথে একপর্যায়ে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয়। বনিবনা না হওয়ায় স্বাধীনচেতা গঙ্গাকিশোর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সোজা কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা পর্বে তাঁর সত্যিকার উন্মেষ ঘটে। এখানে তিনি নিজেকে নতুন করে পরিচিত করেন। পুস্তক প্রকাশ এবং বই বিক্রয় দিয়ে শুরু হয় প্রকাশকের জীবনের। তিনি যখন কলকাতায় পুস্তক ব্যবসা শুরু করেন তখন উল্লেখযোগ্য কোনো বাঙালি এই ব্যবসায়

যুক্ত ছিলেন না। ব্যবসাবিমুখ বাঙালিকে পুস্তক ব্যবসার মত নতুন এক ব্যবসার পথ তিনি দেখান। আর এজন্য তাঁকে প্রথম বাঙালি পুস্তক-ব্যবসায়ীর মর্যাদা দেওয়া হয়।

গঙ্গাকিশোর বাংলা প্রকাশনায় প্রথমে প্রকাশক হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৮১৬ সালে কলকাতার ফেরিস এণ্ড কোম্পানির (Feris & Company) ছাপাখানা থেকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)-এর বিখ্যাত *অন্নদামঙ্গল* (Oonoodah Mangul) কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বই আকারে প্রকাশের আগে *অন্নদামঙ্গল* পুঁথি হিসেবে বহুল প্রচারিত ছিল। অন্নদামঙ্গলের সামাজিক জনপ্রিয়তা ঊনবিংশ শতকের শুরুতে তুঙ্গেই ছিল। প্রকাশনায় ব্যবসায়িক বুদ্ধি তুখোড় হওয়া প্রয়োজন। কোন বই চলবে সেটা অনুমান করার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতি। গঙ্গাকিশোরের সে গুণ ছিল। তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করেন। চিত্রশোভিত বই প্রকাশ করলে এটির প্রচার বেশি হবে তা তিনি জানতেন। তাই তিনি ছবিওয়ালা বই প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করেন। যদিও সেসময়ের প্রেক্ষাপটে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। আঁকা ছবিকে ছাপার কাজে ব্যবহার করার কৃৎকৌশল কলকাতায় তখন আজকের মতন এতটা সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। দৃঢ়চেতা গঙ্গাকিশোর দমে যাবার পাত্র নন। তিনি ঠিকই এ কাজের উপযোগী অংকনশিল্পীকে খুঁজে বের করেন। কারণ তাঁর জানা ছিল, খ্যাতিমান খোদাইশিল্পী পাদরি লসনসহ কতিপয় ইংরেজ নিজেদের প্রয়োজনে কলকাতার গরানহাটার স্বর্ণশিল্পীদের দিয়ে সমতল প্লেটে খোদাই করার নতুন এক রীতি প্রবর্তন করেছেন। চিৎপুরের পাশের গরানহাটার স্বর্ণশিল্পীদের ধাতু খোদাই করার পদ্ধতি জানা না থাকলেও তাঁদের কাঠ-খোদাইয়ের ঐতিহ্য ছিল। ধাতুখোদাইয়ের কাজে সেই ঐতিহ্য ব্যবহার করা হয়। গয়না তৈরির যন্ত্রপাতি দিয়ে গয়না গড়ার মতন করে গরানহাটার শিল্পীরা সমতল প্লেটে ছবি খোদাই করার পদ্ধতি শেখেন।[৬] গঙ্গাকিশোর তাঁর নিজের বইয়ে নতুন এই পদ্ধতির সাহায্য নেন। শ্রীরামপুরীয় স্টাইলে পদ্যভাঙা লাইনে না ছেপে তিনি বাংলা পুথির মতো টানা গদ্যে বইটি ছাপেন। ব্যবহার করেন শ্রীরামপুরীয় অক্ষর। চার টাকা মূল্যমানের বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩২৩টি (৬+৩১৭)। এর সূচিপত্রটি ছাপা হয় 'নির্ঘণ্টন' নামে। গঙ্গাকিশোর ভালোভাবেই জানতেন, লেখার সাথে যদি ছবি যুক্ত করা হয় তাহলে সেই বই দ্রুত পাঠকের নজরে আসবে। নিজের ভাবনাকে রূপ দেওয়ার জন্য *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে 'অন্নপূর্ণা' (Unno Poornah), 'সুন্দরের বর্দ্ধমানে যাত্রা' (Soonder), 'সুন্দরের বর্দ্ধমান পুর প্রেবেস' (Soonder and Durroawn), 'সুন্দরের বকুলতলায় বৈশন' (Soonder), 'বিদ্যাসুন্দরের দর্শন' (Biddah and Soonder) এবং 'সুন্দর চোর ধরা' (Soonder and Cotaul) শিরোনামের মোট ছয়টি ধাতু ও কাঠ-খোদাই চিত্র ব্যবহার করেন। এরজন্য তাঁকে খরচ করতে হয়েছিল ছয় স্বর্ণমুদ্রার কাছাকাছি অর্থ। প্রতিটি ছবির সাথে তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাসঙ্গিক চিত্র-পরিচিতিও যোগ করেন।[৭] এসব ছবির শিল্পীদের সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায়নি। 'সুন্দরের বর্দ্ধমান পুর প্রেবেস' ও 'সুন্দরের বর্দ্ধমানে যাত্রা' ছবি দু'টির শেষে 'Engraved by Ramchand Roy' লেখা দেখে শিল্পী হিসেবে শুধু রামচাঁদ রায়কেই সনাক্ত করা গেছে। ধাতু-খোদাই শিল্পী হিসেবে রামচাঁদ তখন কলকাতায় সুপরিচিত ছিলেন। তাই, তাঁকে দিয়ে দু'টি ছবি গঙ্গাকিশোর করে নিয়েছিলেন কিন্তু বাকি চারটি কাঠ-খোদাই ছবির শিল্পীদের সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সুকুমার

সেন (১৯০১-১৯৯২)-এর মতে, ছবিগুলো দেশি শিল্পীদেরই আঁকা। 'অন্নপূর্ণা'-র পোশাক বিশেষ করে মুকুট ও কেশবিন্যাসে বিদেশি ভাবের স্পর্শ দেখে সুকুমার সেনের মনে হয়েছে, বকুলতলায় উপবিষ্ট সুন্দরের সাথে অশ্বারোহী সুন্দরের আকৃতিতে যথেষ্ট অনৈক্য আছে।[৮] ছবিটি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সুন্দরের কেশ দীর্ঘ এবং গালপাট্টা আছে, যা বাঙালিদের তখনকার পোষাকের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব বিষয় আমলে এনে বলা যায়, সম্ভবত অবাঙালি কোনো শিল্পী ছবিগুলো এঁকেছিলেন, আবার একাধিক শিল্পীরও আঁকা হতে পারে, কোনো কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না। সে যাই হোক না কেন, *অন্নদামঙ্গল* গ্রন্থে ছবি ব্যবহারের ফলে এটি যে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেছিল তা বলা যায়। অন্য কোনো উদাহরণ না পাওয়ায় এখন অবধি এটিকেই প্রথম বাংলা সচিত্র গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়।[৯]

গঙ্গাকিশোরের আগে বাংলা প্রকাশনায় বিশেষত বইয়ে চিত্র ব্যবহারের অন্য কোনো উদাহরণ নেই। যদিও কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ইংরেজি বইয়ে খোদাই চিত্রের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। ১৭৮৫ সালে কলকাতার জর্জ গর্ডনের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত এমিলি ব্রিটলের *দি ইণ্ডিয়া গাইড অর জার্নাল অফ এ বয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ* গ্রন্থে কেপটাউন ও টেবল মাইন্টেনের খোদাই করা ছবি আছে। একই বছর ডানিয়েল স্টুয়ার্টের *Twelve Views of Calcutta* গ্রন্থেও খোদাই ছবির ব্যবহার দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি, ২০টি ছবির দেখা মেলে *Twenty sketches Illustrative of Oriental Manners and Customs* নামক বইতে। এটি ১৭৯৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ হয়েছিল। ছবিগুলোর চিত্রশিল্পী ছিলেন রবার্ট ম্যাবন। ১৭৯৮ সালে শিল্পী ডরমিয়েক্সের আঁকা ১টি এবং রবার্ট হোমের আঁকা ৪টি ছবি নিয়ে প্রকাশিত হয় *ওরিয়েন্টাল মিসেলেনি* নামক আরেকটি গ্রন্থ। এক বছর বাদে ১৭৯৯ সালে সলভিনস-এর বিখ্যাত বই *A Collection of two hundred and fifty coloured etchings descriptive of manners, customs and dresses of Hindoos* প্রকাশিত হয়। এখানে বিভিন্ন পেশা ও বর্ণের মানুষের পাশাপাশি উট, হাতি, হুঁকো, চড়ক, সতীদাহের ছবি আছে।[১০] ঊনবিংশ শতকের শুরুতে কলকাতায় চিত্রশোভিত বইয়ের যে ব্যাপক চাহিদা ছিল তা এসব উদাহরণ থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বই প্রকাশের সময় গঙ্গাকিশোরের ছবিওয়ালা বইয়ের কথা মাথায় ছিল। প্রকাশনায় নেমে তিনি বইয়ে আঁকাছবির ব্যবহার শুরু করেন। যদিও আজকের মতন বাংলা বইয়ের বাজার তখন এতোটা বিস্তৃত ছিল না, পাঠক সংখ্যাও ছিল খুব সীমিত। কিন্তু তিনি জানতেন, বইকে পাঠকের দৃষ্টিতে আনতে হলে সাদামাটাভাবে প্রকাশ করলে হবে না। এর পাশাপাশি প্রচারের কাজটা যথাযথভাবে করতে হবে, নাহলে বই বাজারে বিকবে না। বইটির কত কপি ছাপা হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে গঙ্গাকিশোর যখন বই ছাপেন তখন ছাপার অর্থ ক্রেতাদের কাছ থেকে আগাম নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সেসময় নতুন বই বাজারে আসলে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। গঙ্গাকিশোরও সে কাজটি করেন। বইটির প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮১৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি *গবর্মেন্ট গেজেট* পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়:

মেক্স ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
ছাপাখানায় সিঘ্র প্রকাষ হইবেক
অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক
অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত
পদ্মলোচন চূড়ামনি ভট্টাচার্য্য মহাস
য়ের দ্বারা বর্ন্ন সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা
অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি
উপক্ষণে এক২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য
৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায়
কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
ভট্টাচার্যের নিকট পাঠইবেন ইতি–[১১]

বিজ্ঞাপনটি বেশ চমকপ্রদ। এখানের 'বর্ন্ন সুদ্ধ' তথ্যটি পাঠকদের ধন্দে ফেলতে পারে। বর্তমান সময়ের নিরিখে বলা যায়, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের কলকাতার ব্রাহ্মণেরা ছিলেন প্রচণ্ড গোঁড়া মানসিকতার। খ্রিষ্টানদের স্পর্শ আছে এমন বই পাঠে গোঁড়া হিন্দুরা ছিলেন ভীষণ অনাগ্রহী। সে সময়ের মুদ্রণব্যবস্থা নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩৩-১৯৯৭)-র করা মন্তব্য বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন:

> গঙ্গাকিশোরের সময় বই ছাপানোর হাজার ঝকমারি। হিন্দু সমাজের হাড়-মাংসে জড়ানো তখন নানান রকমের সংস্কার। সাহেবরা বেনিয়াগিরি করেই হঠাৎ বড়লোক। এদিকে কেউ সাহেবদের দেশে গেলে, তাকে করা চাই একঘরে। শেষ পর্যন্ত গোবর-গঙ্গাজল খাইয়ে প্রয়াশ্চিত্তি। বইয়ের বেলাতেও নিস্তার নেই এই ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যার। তাই ছাপাখানা দেখলেই চোখ বুজিয়ে বসতেন ধার্মিক হিন্দুরা। মুখে নারায়ণ! নারায়ণ! তাদের কাছে ছাপা বই মানেই অস্পৃশ্য, অচ্ছুত। সেটা যদি আবার ধর্মের বই হয়, তাহলে তো কথাই নেই। আগুনে পোড়াতে পারলে বাঁচা যায় যেন। বিদেশী-বিজাতীয়দের প্রেসে ছাপা হবে ধর্মের বই? এসব হোল পাদ্রীদের ষড়যন্ত্র। এমনও নাকি ঘটেছে যে ছাপাখানা বা ছাপা বই দেখে কোনো কোনো ধার্মিক তিনবার ডুব দিয়ে এসেছেন গঙ্গাজলে। অবশ্য গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে নিলে সাত খুন মাপ।[১২]

এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, কলকাতার তৎকালীন সামাজিক অবস্থা আজকের মত ছিল না। গঙ্গাকিশোর কলকাতার সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এজন্য গঙ্গাজল মিশানো কালি দিয়ে *অন্নদামঙ্গল* ছেপেছেন এমন কথা বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে বলতে হয়েছে। নদিয়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য বর্ণশুদ্ধের কাজটি করেন। পদ্মলোচন ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত। শুধু বর্ণশুদ্ধ নয়, গঙ্গাকিশোর ছাপার আগে পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা পর্যন্ত করেন। শ্রীরামপুরে থাকার সময় সম্পাদনার কাজ শিখেছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশের সময় তা কাজে আসে। *অন্নদামঙ্গল* ছাপার কাজ শুরু হয় ১৮১৪ সালে এবং শেষ হতে সময় লাগে বছর দুই। বইটি যাতে পাঠকের হাতে সরাসরি পৌঁছায় সেজন্য বিজ্ঞাপনের শেষে প্রাপ্তিস্থান হিসেবে তিনি নিজের অফিসের নাম উল্লেখ করেন। এটি ছিল তখনকার রীতি। কারণ, আজকের মত সেসময় বই বিক্রির জন্য আলাদা কোনো বইয়ের দোকান ছিল না। প্রকাশকেরা নিজেদের বাড়ি অথবা অন্য কোনো জায়গা

থেকে বই বিক্রি করতেন। উৎসাহী পাঠকেরা সে অনুযায়ী খোঁজ করে পছন্দানুযায়ী বই সংগ্রহ করতেন। কোনো কোনো প্রকাশক বই ফেরি করার জন্য আলাদা লোক নিযুক্ত করেছিলেন। ফেরিওয়ালারা পাঠকের কাছে তাঁদের পছন্দানুসারে বই পৌঁছে দিত। বই বিপণনটা আজকের মতন এমন সরল ছিল না। বই প্রকাশের পাশাপাশি গঙ্গাকিশোর বইয়ের বিপণন নিয়েও ভাবেন। বিজ্ঞাপনে তিনি এজন্য ছাপাখানার নাম ব্যবহার করেন।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রকাশক হিসেবে গঙ্গাকিশোরকে মেনে নিয়েছেন।[১৩] অবশ্য এ মত নিয়ে সুকুমার সেন সংশয় প্রকাশ করেন। *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রকাশক হিসেবে তিনি গঙ্গাকিশোরকে মানেননি, শুধু পুস্তক-বিক্রেতা বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, "অন্নদামঙ্গলের এই প্রথম ছাপা সংস্করণের কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন। তিনি এ কথাও বলে গেছেন যে বইটির প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ... প্রকাশিত গ্রন্থে কিন্তু কোথাও গঙ্গাকিশোরের নাম নেই।"[১৪] গ্রন্থে গঙ্গাকিশোরের নাম নেই বলে তিনি এর প্রকাশক নন এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। শুরুর দিকের অনেক বাংলা বইয়ে প্রকাশকের নাম নেই। এমনকি ছাপাখানার নামটিও কোনো কোনো বইতে ঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রথম দিকের সব বাংলা বই অনুসরণ করেনি। *অন্নদামঙ্গল*-এর ক্ষেত্রেও হয়তো এমনটা হয়েছে। এসব বিষয় আমলে এনে বলা যায়, গঙ্গাকিশোরই ছিলেন *অন্নদামঙ্গল*-এর সত্যিকারের প্রকাশক, অন্য কেউ নন।

অন্নদামঙ্গল ছাপায় গঙ্গাকিশোরের কপাল খুলে। তিনি *অন্নদামঙ্গল*-এর ব্যবসায়িক সাফল্যতে উৎসাহিত হয়ে সে বছর অর্থাৎ ১৮১৬ সালে ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা থেকে *গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী* নামে আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ বইতেও তিনি ছবি ব্যবহার করেন। বইটির শুরুর মা গঙ্গার ছবিটি দৃষ্টিনন্দন। বিশ্বম্ভর আচার্য্য খোদিত ছবিটি গ্রন্থাকারের বক্তব্যের সাথেও মানানসই। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বইটির মূল রচয়িতা।[১৫] এভাবে সচিত্র বই ছেপে গঙ্গাকিশোর বাংলা প্রকাশনায় নিজের অবস্থানকে শক্ত করে তোলেন। পুস্তক-ব্যবসাকে তিনি লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যান। ফলে সচিত্র বাংলা বইয়ের নতুন এক ধারা তৈরি হয়। পরবর্তীতে তাঁর দেখানো পথে অনেকে হাঁটেন। *সঙ্গীততরঙ্গ* (১৮১৮), *সিংহের বিবরণ* (১৮১৯), *বিদ্যাসুন্দর* (১৮২৩), *জ্যোতিশ্চন্দ্রিকা* (১৮২৪), *বত্রিশ সিংহাসন* (১৮২৪), *চণ্ডীমঙ্গল* (১৮২৪), *আনন্দলহরী* (১৮২৪), *গৌরিবিলাস* (১৮২৪), *বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিনী* (১৮২৪), *অন্নদামঙ্গল* (১৮২৪), *হরিহরমঙ্গল* (১৮৩১), *কালীকৈবল্যদায়িনী* (১৮৩৬), *ভগবত গীতা* (১৮৩৬), *পক্ষীর বিবরণ* (১৮৪৪), *মনতত্বসার* (১৮৪৯), *হরপার্বতীমঙ্গল* (১৮৫১), *পঞ্চদশী* (১৮৬২)-র মতন চিত্র-শোভিত বাংলা বই গঙ্গাকিশোরের দেখানো পথে প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের পুরো সময় ছিল সচিত্র বাংলা বইয়ের জয়-জয়কার। বিংশ শতকেও সে ধারা অব্যাহত থাকে।

বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসে 'বটতলা' এক বিশিষ্ট নাম। স্বল্প মূল্যে বিচিত্র বিষয়ের বাংলা বই প্রকাশের নতুন এক ধারার জন্ম দিয়েছিল বটতলা। সুকুমার সেন বটতলার চৌহদ্দিকে নির্দেশ করেন এভাবে, "দক্ষিণে বিডন স্ট্রিট ও নিমতলা ঘাট স্ট্রিট পশ্চিমে স্ট্র্যান্ড রোড,

উত্তরে শ্যামবাজার স্ট্রিট এবং পূর্বে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট নিয়েই গড়ে উঠেছিল কলকাতার বটতলা।"[১৬] কলকাতার অনুসরণে ঢাকাতেও বটতলা-সাহিত্য গড়ে ওঠে। 'বটতলা-সাহিত্য' নামে আলাদা এক প্রকরণের সৃষ্টি হয়। বাংলা প্রকাশনায় এর রেশ অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উনিশ শতকের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এমন কোনো বাঙালি লেখক বা প্রকাশক নেই যিনি বটতলা-সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হননি। শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেব ছিলেন বটতলার আদি পুরুষ আর গঙ্গাকিশোর ছিলেন বটতলার প্রথম হাটুরে। তিনি বটতলার চৌহদ্দিতে থেকে শুধু অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্যই নয়; আদিরস, রসমঞ্জরিও প্রকাশ করেছিলেন।[১৭]

বটতলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কম খরচে দ্রুত সময়ে যে কোনো বিষয়ের বই প্রকাশের সক্ষমতা। এর বিশাল এক পাঠকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বিপণন ব্যবস্থা ছিল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে দূরবর্তী গ্রামে সহজেই পৌঁছে যেত বটতলা থেকে প্রকাশিত নতুন যেকোনো বই। বটতলা বইয়ের বিস্তৃত বাজার বিষয়ে সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) অবগত ছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন এমন একজন প্রকাশক নির্বাচন করতে যিনি তাঁকে কম খরচে বই প্রকাশ কওে দেবে। একই সাথে বিপণনটা ভালোভাবে করবে। বই প্রকাশ ও বিপণন নিয়ে রামমোহন খুব একটা মাথা ঘামাতে বা ভাবতে চাননি। নিজের বইয়ের প্রকাশের সময় তিনি গঙ্গাকিশোরকে প্রথম প্রকাশক হিসেবে নির্বাচন করেন। বটতলা গবেষক জীবনানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

> গঙ্গাকিশোর ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ। তিনি বটতলার বাজার বুঝেছিলেন। এর ফলে প্রচুর লাভও করেছিলেন। অদূরে রামমোহন গঙ্গাকিশোরের এই ব্যবসায়িক বুদ্ধি লক্ষ করেছিলেন। বহরা গ্রামনিবাসী হরচন্দ্র রায় রামমোহনের আত্মীয়সভার সভ্য ছিলেন। রামমোহন দেখেছিলেন তাঁর বক্তব্য বেশি লোকের কাছে সুলভে পৌঁছে দেবার বাহন হতে পারেন বটতলার গঙ্গাকিশোর। রামমোহনের *কবিতাকারের সহিত বিচার* বইয়ের প্রকাশক হিসেবে এবার গঙ্গাকিশোরের নাম দেওয়া গেল। কিন্তু হরচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে রামমোহন গঙ্গাকিশোরকে হয়ত আরও নতুন মতলব দিয়েছিলেন। ব্যবসায়িক এই মতলব adopt করে নিলেন গঙ্গাকিশোর।[১৮]

গঙ্গাকিশোর ফেরিস এন্ড কোম্পানি থেকে রামমোহনের *বেদান্ত গ্রন্থ*, *বেদান্ত সার*, *দায়ভাগ* ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করেন। এসব বইয়ের বিক্রি ছিল বেশ ভালো। কোন বই বাজারে মাতাবে তা গঙ্গাকিশোর ভালো বুঝতেন। নামী লেখকের বই বেচে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি লাভের মুখ দেখেন। রামমোহনের বইয়ের কাটতি ভালো ছিল বলে প্রথম থেকেই এসব বইয়ের প্রকাশের জন্য গঙ্গাকিশোর বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কারণ বিষয়ের নতুনত্ব এবং রামমোহনের সামাজিক পরিচিতি বই কাটতিতে প্রভাব রাখতো। রামমোহন ছাড়া অন্য লেখকদের বইও তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে ছিল *লক্ষ্মীচরিত্র*, *বেতাল পঞ্চবিংশতি*, *চাণক্যশ্লোক* ইত্যাদি। যদিও রামমোহনের বইয়ের মত অন্যদের বই বাজারে তেমন বিক্রি হতো না। অন্যদের পাশাপাশি নিজের রচিত দুই-তিনখানি বইও গঙ্গাকিশোর ছাপেন। তাঁর *A Grammar in English and Bengalee* গ্রন্থটি যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। ২১৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি একই প্রকাশনী অর্থাৎ ফেরিস কোম্পানি প্রেস থেকে ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হয়। কেউ-কেউ একে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ বলে ভুল করেন।

বাস্তবিক অর্থে এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি ইংরেজি ব্যাকরণ। বাংলায় ইংরেজি ব্যাকরণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে গ্রন্থাকার গঙ্গাকিশোর অবগত ছিলেন, তিনি বলেন:

> এতদ্দেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া অত্যল্প কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছল্য এবং অশ্রদ্ধা জন্মে তাহার কারণ এই অভিপ্রায় হয় যে বালকত্ব ধর্ম্ম হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মোনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকরণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনের দেন তাহা মোনে রাখিতে পারেন না অতএব শুৎরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক মনুষ্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠীন এবং শ্রম সাধ্য হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি সুসাধ্য হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল।[১৯]

ব্যাকরণ বইটি প্রকাশের বছর গঙ্গাকিশোর *দায়ভার* নামে আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটিও ফেরিস কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮২০ সালে *চিকিৎসার্ণব* নামক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭২। শুরুতে গ্রন্থাকার হিসেবে গঙ্গাকিশোরের নাম আছে। শুধু প্রকাশক হিসেবেই নয় সম্পাদনাতেও গঙ্গাকিশোর কৃতিত্ব দেখান। ১৮২৪ সালে *দ্রব্যগুণ* গ্রন্থটি তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পাঠকপ্রিয়তার কারণে এটি পরে পুনর্মুদ্রিত হয়। পুনর্মুদ্রণের কাজটিও তিনি করেন। যেমনটা করেন *শ্রীভগবতগীতা* গ্রন্থের জন্য। ১৮২০ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর আখ্যাপত্রে বলা হয়:

শ্রীশ্রীহরি
শ্রীভগবতগীতা
নমো ভগবতে বাসুদেবায়
অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ
গদ্যরচিত ভাষাঅর্থসংগ্রহ
শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন প্রকাশিত।
বাঙ্গালা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।
মোকাম বহেরা।
সন ১২৩১ সাল।[২০]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বই প্রচারের জন্য তাঁর আলাদা বিক্রয় প্রতিনিধি ছিল। প্রতিনিধিরা বই ফেরি করে বেড়াতো। গঙ্গাকিশোর নিজের ও অন্যের বই প্রচারের জন্য কলকাতা ছাড়া প্রধান-প্রধান শহরে এমনকি গ্রামেও বিক্রয়-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে বইয়ের প্রচার-প্রসারে তাঁর নেটওয়ার্ক অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিক্রয়-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পাঠকের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার কাজটি বাংলায় সম্ভবত তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন।

বই প্রকাশের পর গঙ্গাকিশোর সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অধিকসংখ্যক পাঠকের কাছে নিজের বক্তব্য পৌঁছানোর তাগিদ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশে তিনি উদ্যোগী

হন। বইয়ের মত সংবাদপত্র প্রকাশ করতে চাইলেই করা যায় না, এরজন্য থাকা চাই পূর্ব-প্রস্তুতি। সবার আগে দরকার অনুমতি পত্র। পত্রিকার পাঠক বইয়ের থেকে বেশি এবং দ্রুত যেকোনো বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়া যায় বলে সেসময় এটিই সবচেয়ে ভালো মাধ্যমে ছিল। কলকাতায় হরচন্দ্র রায় নামক একজন প্রকাশক ছিলেন। 'বাঙ্গালী প্রেস' নামে তাঁর নিজস্ব একটি ছাপাখানা ছিল। গঙ্গাকিশোরেরও একটি কাঠের মুদ্রণযন্ত্র ছিল। মুদ্রণযন্ত্রটি নিয়ে তিনি হরচন্দ্র রায়ের সাথে দেখা করেন। এরপর দু'জনে মিলে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। *বাঙ্গাল গেজেটি* (Bengal Gazette) নামক সংবাদপত্রটি বাঙ্গালী ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মূলত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮১৮ সালের মে মাসে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[২১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তা ১৮১৮ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ হয়েছিল।[২২] পত্রিকা প্রকাশের তারিখ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। তবে এটি যে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙালি কর্তৃক সংবাদপত্র প্রকাশের পুরো কৃতিত্ব গঙ্গাকিশোরের প্রাপ্য। *বাঙ্গাল গেজেটি* প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে শ্রীরামপুর থেকে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের চেষ্টায় *সমাচার দর্পণ* নামে আর একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হয়। *বাঙ্গাল গেজেটি* এবং *সমাচার দর্পণ*-এর মধ্যে কোনটি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র এ নিয়েও বিতর্ক আছে। সে বির্তকে না জড়িয়ে শুধু এতটুকু বলা যায়, বাঙালি হিসেবে কলকাতা থেকে গঙ্গাকিশোরের সম্পাদনায় প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকা প্রকাশের পুরো সময়টা তিনি হরচন্দ্র রায়ের ৪৫ নম্বর চোরাবাগান স্ট্রিটের *বাঙ্গালী প্রেস*কে ব্যবহার করেন। হরচন্দ্রের ছাপাখানাটির জন্ম ১৮১৬ সালে। কলকাতায় তখন বাংলা ছাপার জন্য বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত মোট চারটি প্রেস ছিল। এগুলো হলো লালবাজারের 'হিন্দুস্থানী প্রেস', চোরাবাগানের 'বাঙ্গালী প্রেস', পটলডাঙ্গার 'সংস্কৃত প্রেস' এবং 'বিশ্বনাথ দেবের প্রেস'। অন্যসব প্রেসের মালিকানা ইংরেজদের ছিল। *বাঙ্গাল গেজেটি* পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক-মুদ্রাকর হিসেবে গঙ্গাকিশোরের নাম বলা হলেও অনেকে হরচন্দ্র রায়কে পত্রিকাটির প্রকাশক হিসেবে মনে করেন। কারণ ১৮২০ সালে ১৪ মে ও ৯ জুলাই তারিখে *The Friends of India* পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞাপনে হরচন্দ্র রায়কে এমনভাবে পরিচয় করানো হয়েছে।[২৩] *বাঙ্গাল গেজেটি*-এর কোনো সংখ্যা রক্ষা না পাওয়ায় এর বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ১৮১৮ সালের ১৪ মে *Oriental Star* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়, পত্রিকাটিতে সরকারি বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ এবং স্থানীয় মানুষদের কথা প্রকাশ হতো। এমনকি রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ে লেখা 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটিও প্রথম এ পত্রিকায় প্রকাশ হয়।[২৪] এর মাসিক মূল্য ছিল সডাক দুই টাকা। প্রচার সংখ্যা, পাঠকদের পরিচয়, বিপণন পদ্ধতি নিয়ে অনুমান-নির্ভর ছাড়া কোনো মন্তব্য করা যায় না। তবে এতটুকু বলা যায়, পত্রিকা প্রকাশের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা না থাকা এবং হরচন্দ্র রায়ের সাথে গঙ্গাকিশোরের মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় *বাঙ্গাল গেজেটি* দীর্ঘজীবন লাভ করেনি। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র এক বছর। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গঙ্গাকিশোর হতাশ হন এবং নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে নেন। কাঠের মুদ্রণযন্ত্রটি নিয়ে এরপর জন্মভিটা বহেরার চলে অসেন। অন্যদিকে হরচন্দ্র রায় তাঁর ছাপাখানাটি ৯ নম্বর আড়পুলি লেনে

স্থানান্তর করেন। পরে গঙ্গাকিশোরের ছাপাখানাটি *বাঙ্গালাযন্ত্র* এবং হরচন্দ্রের ছাপাখানাটি *আড়পুলির ছাপাখানা* বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২৫] *বাঙ্গাল গেজেটি* পত্রিকা ছাড়া গঙ্গাকিশোর-হরচন্দ্রের ছাপাখানা থেকে অন্য কোনো পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ইতিহাসবিদ নিখিল সরকার (১৯৩২-২০০৪) (শ্রীপান্থ ছদ্মনামে যিনি অধিক পরিচিত) জানান, "গঙ্গাকিশোর ছাপাখানার কাজ এরপরেও বেশ কিছুকাল চালিয়ে যান। ...সম্প্রতি শ্রীদাশরথি মশাই গঙ্গাকিশোর এবং হরচন্দ্রের ছাপাখানা সংক্রান্ত কিছু দলিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করেছেন। তার মধ্যে বহড়ায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সরকারি অনুমতিপত্রটিও রয়েছে। অনুমতি দিচ্ছেন চীফ সেক্রেটারি এম.এল.বেইলি। তারিখ ২ এপ্রিল, ১৮১৯ সন।"[২৬] এ তথ্যের মাধ্যমে বলা যায়, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য গঙ্গাকিশোরের সরকারি অনুমতিপত্র ছিল। ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠার পরে *বাঙ্গালাযন্ত্র* ছাপাখানাটি অনেকদিন পর্যন্ত সচল ছিল। ১৮৩৯ সালে ছাপাখানাটি থেকে মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গভাষাভিধান* নামক একটি গ্রন্থ ছাপা হয়। এর আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে:

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং
বঙ্গভাষাভিধান
অর্থাৎ
বালকদিগের শিক্ষার্থে
অকারাদি ক্ষকারান্ত শব্দ অনুলোমে
তদর্থ তদ্ভাষায় বিন্যাস পূর্বক
ঁগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয়স্য
বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে
শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক
বহেরা গ্রামে মুদ্রাঙ্কিত হইল
বঙ্গাব্দ ১২৪৬ সংখ্যক
দানিশাব্দ ৮৯ সংখ্যক।[২৭]

আসলে কলকাতার অদূরবর্তী বহেরা গ্রামে এমন একটি ছাপাখানা দীর্ঘ দিন সচল থাকা আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, তখন পর্যন্ত বাংলা মুদ্রণের যাবতীয় কাজ কলকাতাতেই হতো। কলকাতার বাইরের ছাপাখানার বিস্তার সেভাবে হয়নি। গঙ্গাকিশোরের মতন উদ্যোগী কোনো কোনো পুরুষ নিজের মতন করে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতার বাইরে থেকেও যে ছাপাখানা চালানো যায় তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ স্থাপন করেন গঙ্গাকিশোর। সুকুমার সেন বাঙালি পুস্তক-প্রকাশকদের ব্রহ্মা হিসেবে গঙ্গাকিশোরকে অভিহিত করেছেন। বস্তুত তিনি তেমনই ছিলেন। বাংলা প্রকাশনার জগতকে গঙ্গাকিশোর অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৩১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, তার আগপর্যন্ত ছাপাখানাটি সচল ছিল। এমনকি এর পরেও আরো বেশ কিছুকাল সচল ছিল। কিন্তু কী মাত্রায় এবং কোন ধরনের প্রকাশনা এখান থেকে হতো তা জানা যায়নি। ছাপাখানাটির অস্তিত্ব আজ আর নেই কিন্তু বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য যে সূচনাটুকু করেছিলেন তা তুলনারহিত।

তথ্যসূচি:

---

১ অঞ্জলি বসু (সম্পা.), *বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১০), পৃ. ১৭৭

২ মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী-যুগ* (ঢাকা: বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২), পৃ. ২৭

৩ সোমব্রত সরকার, *বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫), পৃ. ৫৩

৪ সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২২১

৫ আশিস খাস্তগীর, *উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা* (কলকাতা: সোপান, ২০১৪), পৃ. ৩০

৬ অসিত পাল, *উনিশ শতকের কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয়গোপাল দাস* (কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৩), পৃ. ১-২

৭ সোমব্রত সরকার, *বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত*, পৃ. ৬৯

৮ সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮), পৃ. ১৩২

৯ পূর্ণেন্দু পত্রী, *কলকাতার প্রথম* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২), পৃ. ১৬

১০ আগ্রহী পাঠকেরা উনিশ শতকের বাংলা বইয়ে গ্রন্থচিত্র নিয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ* (২০১১) নামক গ্রন্থটি দেখতে পারেন। এখানে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, নরেন্দ্রনাথ লাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, কমলকুমার মজুমদার, পঙ্কজকুমার দত্ত প্রমুখ প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধসমূহের পাশাপাশি এর ভূমিকাংশটি গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকায় স্বপন বসু কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিদেশি লেখকদের বইয়ে আঁকা-ছবি ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে এসব উদাহরণ দিয়েছেন।

১১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'খোদাই-চিত্রে বাঙালী: প্রাচীন কাঠ-খোদাই', *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা (১৩৪৬), পৃ. ১৫৫

১২ পূর্ণেন্দু পত্রী, *কলকাতার প্রথম*, পৃ. ১৬-১৭

১৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৫ বাংলা), পৃ. ৪৪৯

১৪ সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, পৃ. ৩১

১৫ সোমব্রত সরকার, *বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন: ১৭৭৮-২০১৪* (কলকাতা: বর্ণপরিচয় পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫), পৃ. ৫৩

১৬ সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, পৃ. ৭০

১৭ শ্রীপান্থ, *বটতলা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ১৭

১৮ জীবনানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *বটতলার ভোরবেলা* (কলকাতা: পারুল, ২০১০), পৃ. ৪১

১৯ গ্রন্থটি সহজলভ্য না হওয়ায় তথ্যের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জীবনী গ্রন্থ সাহিত্য-সাধক চরিতামালার সপ্তম খণ্ড *গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য*-নামক জীবনী গ্রন্থটির উপর নির্ভর করা হয়েছে। এটি ১৯৫৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত তথ্যটি এর ১৯ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

২০ তদেব, পৃ. ২৩

২১ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, 'বাঙালীর সাংবাদিকতার আদিপর্ব', আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সম্পা.), *সমকালীন: নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৪১৩), পৃ. ২৩৫

২২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, পৃ. ৪৪৯
২৩ তদেব, পৃ. ৭৪১-৭৪২
২৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য*, পৃ. ১৭
২৫ আশিস খাস্তগীর, *উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা*, পৃ. ৩০
২৬ শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬), পৃ. ১১০-১১১
২৭ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *বাংলা অভিধানগ্রন্থের পরিচয়* (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০)